পূর্ব থেকে পশ্চিম

পর্বঃ ২

ইমিগ্রেশান অফিসার কোনক্রমেই আমাকে ক্লিয়ারেন্স দেবেন না। আমি বুঝতে পারলাম না, খুব সহজেই আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিচয় গোপন করতে পারতাম, এমনকি পাসপোর্টেও সেটা না রাখতে পারতাম, সে-ক্ষেত্রে তারা কি করে আমাকে আটকাতেন? বাংলাদেশ সরকারেরতো এমন কোন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা নেই যেখান থেকে তারা আমার সব তথ্য পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ-মুহূর্তে কি-হলে কি-হতে পারত, সে-সব ভাববার অবকাশ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত ক্ষমতাধারীদের ফোন করতে পারি, তাদের কাছে এর সমাধান দুধ-ভাত; এমন কাউকে দিয়ে ফোন করাবে, হয়তো তখন ইমিগ্রেশান অফিসার নিজেই প্লেন-এ তুলে দিয়ে আসবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যে-সময় হাতে আছে, তাতে, তুলে দেবার অনেক আগেই প্লেন আসমানে লুকোবে।

ছোটবেলায় আমার পাশের বাড়ির কাকাদের দেখতাম বিদেশ যাচ্ছে। সবাই চোখের জলে, মুখের জলে চারপাশ ভিজিয়ে, আকাশে-বাতাসে মাতম তুলে, আশপাশের পাড়া প্রতিবেশীদের জানান দিয়ে তাদের বিদায় দিত। যাবার আগে তারাও তাদের নানা ইচ্ছার কথা, অনিচ্ছার কথা, শুরুর কথা, শেষের কথা, বলা না-বলা কথা,সবকিছু নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে যেত। বিশেষ করে বাড়ীর বউদের বারবার করে সাবধান করে দিত, তাদের অবর্তমানে তাদেরর মা-বাবার যেন বিন্দুমাত্র অযত্ন,অবহেলাও না হয়। যদিও বাড়ীতে থাকা অবস্থায় নানাবিধ কারণে-অকারণে তারা নিজেরাই মা-বাবার যত্ন করবার দিকে খুব একটা নজর দিতে পারেনি। অন্যদিকে তাদের যাওয়া উপলক্ষ্যে বাড়ির উঠোনের লাল মুরগীটা কিংবা পুকুর থেকে তোলা বড় রুই মাছটাও নির্বিচারে প্রাণ বিসর্জন দিত। যাওয়ার পর, সারাদিন বাড়ীর সবাই মন খারাপ করে রাখতো,কেউ ইচ্ছায়, কেউ অনিচ্ছায়। সবার দেখাদেখি আমিও একটু মন খারাপ করে থাকতাম, মনখারাপ নিয়ে রাতে ঘুমোতে যেতাম। সকাল বেলা হয়তো ঘুম থেকে উঠে দেখতাম, আমার সেই কাকা রীতিমতো লুঙ্গি পরে, আয়েশী ভঙ্গিমায় সময় নিয়ে, পুকুর ধারে দাঁত ব্রাশ করে চলছে। ঘটনা হচ্ছে, বিদেশ যাবার পথে কোনো এক এয়ারপোর্ট থেকে তাকে ফেরত পাঠানো হয়েছে, কাগজপত্র ঠিক নেই ব'লে। কাকা আমার ব্রাশ করতে করতে সবাইকে বুঝাতে চেষ্টা করত, কেমন করে নিজের মাথার বুদ্ধি খাটিয়ে, ইমিগ্রেশান অফিসারদের নাস্তানাবুদ করে, একদিনও জেল না খেটে সে বাড়ি ফিরে এসেছে।তার

জায়গায় অন্য কেউ হ'লে, একেবারে কম হলেও দশ বছরের জেল হয়ে যেত। আমি আমার সেই কাকার কথা ভাবছিলাম, আর ভাবছিলাম, আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে ঠিক কয় বছরের জেল হ'ত বলে গল্পটা বানাবো।

কোন এক ব্লগে পড়েছিলাম, দেশের বাইরে যাওয়ার সময় সব ধরণের ডকুমেন্টস-এর ফটোকপি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ভালো। হঠাৎ মনে হলে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেয়া 'রিলিজ লেটার' এর কপি আমার কাছে আছে। এটা আমি ইমিগ্রেশান বা কোথাও দরকার হতে পারে ব'লে রাখিনি, অন্যসব কাগজপত্রের সাথে এমনিতেই রেখে দিয়েছিলাম। আর পায় কে? বিতর্কের মাঠে এবার আমি ম্যারাডোনা। ইমিগ্রেশান অফিসারকে বললাম, 'বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেয়া 'রিলিজ লেটার' আমার কাছে আছে।' উত্তর এলো, 'সেটাতে কাজ হবে না।' আমি বললাম, 'কেন হবে না?'। তিনি বললেন, 'আপনার জিও লাগবে।' ভাবখানা এমন যে, 'একবার বলেছি জিও লাগবে, তো ওটাই লাগবে। সেটা না হ'লে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারেও কাজ হবে না।' আমার মনে হচ্ছে একটু পরে হয়ত বলবে, 'এখন আর জিও দিলেও হবে না, যান, আপনি বাসায় গিয়ে ঘুমান।' আমি বললাম, 'সরকার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে পারমিশান দেয়া আছে, রিলিজ লেটার দেবার জন্য।' বস্তুত,আমার রিলিজ লেটারে সরকারের একটা অধ্যাদেশের রেফারেন্সও দেয়া আছে। তারপর তিনি সেটা দেখতে দেখতে বললেন, 'এটাতেতো হবেইনা, তাও আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

যথারীতি স্যারকে ডাকা হল। ভাবলাম, দিনের পর দিন 'স্যার' ডাক শুনতে শুনতে সকাল গেল, বিকাল গেল; আজকে না জানি কোন মহাস্যারের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছি। অফিসার বলেন, 'স্যার উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কিন্তু উনার 'জিও' নেই।' স্যার বলেন,'কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক?' অফিসার বলেন,'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। স্যার রাগত স্বরে বলেন, 'আরে সেটাতো বুঝলাম, ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু ঢাকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়?' হায় কপাল! আমি কোথায় আছি? রঙ্গ ভরা এই বঙ্গদেশে কে-যে অফিসার, কে-যে তার স্যার, কি তার আচার, কিইবা ন্যাচার- তা একমাত্র ওপরওয়ালাই জানেন। আমার সেই কিংবদন্তির রিক্সাওয়ালার গল্পটা মনে প'ড়ে গেল। যাত্রি রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাবে নাকি?' রিক্সাওয়ালা বলে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়? এটা আবার কোন জায়গায়? ঢাকা ইনভার্সিটির কোন পাশে?' আমি এয়ারপোর্টের মহান স্যারকে বললাম, 'আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার।' কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর তার অফিসারকে বললেন, 'উনার কি অন্য যে-কোন ডকুমেন্ট আছে?' অফিসার বলেন,'রিলিজ লেটার আছে।' স্যার বলেন, 'তাড়াতাড়ি যেতে দাও।' সব ঝামেলা

এখানেই শেষ। মহামান্য অফিসার এবার আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনার বাড়ী কোথায়?’ এবার আর যায় কোথায়? কয়েকশো মণ ওজনের ভাব নিয়ে, রাশভারী কণ্ঠে আমি বললাম,‘পাসপোর্টে দেখেন।’

ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতেই মনটা ভালো হয়ে গেল। ‘বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমার দেশও এগিয়ে যাচ্ছে।’ তিন-তিনটা কম্পিউটার এক লাইনে, ইন্টারনেট ব্যবহার করবার জন্য। যাক কিছুটা হলেও এয়ারপোর্টটা সার্ভিস দিতে শিখছে। আধুনিক বিশ্বের যে-কোন এয়ারপোর্টেই ইন্টারনেট ব্রাউজ করার সুযোগ থাকা উচিৎ, এখানেও আছে। খুশি মনে এগিয়ে গেলাম। প্রথমেই দিলাম, ‘গুগল ডট কম।’ অবিশ্বাস্য স্পীড-এ রেসপন্স আসলো, ‘সার্ভার নট ফাউন্ড।’ নিজের মনে নিজেই হেসে ফেললাম। আগের বাক্যটি খানিকটা পরিবর্তন করে নিয়ে বললাম, ‘বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সেটাই বা কম কি?’ তবে কেমন জানি আঙ্গুর ফল টক টাইপ ব্যাপার হয়ে গেলো। আবার এ-ও মনে হলো, আরে আঙ্গুর ফলতো টক-ই।

বোর্ডিংয়ের সময় হয়ে এলো। এয়ারপোর্ট-এর অন্য আর চার-পাঁচটা বিমানের থেকে কাতার এয়ারওয়েজের বিমানটাকে বেশ রূপসী আর হৃষ্টপুষ্টই মনে হলো। ছোটবেলায় এক হুজুরের ওয়াজ শুনতে গিয়েছিলাম; বেহেস্তের হুরী’রা কেমন সেটা বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, বেহেস্তের হুরী’রা বিমানবালাদের থেকেও সুন্দরী। এইতো আর মাত্র কয়টা মিনিট! তারপর বেহেস্তের কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। বিপুল উৎসাহ,উদ্দীপনা ও ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিমানে প্রবেশ করলাম। হায় খোদা! এ কি? এর তুলনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটের ‘সোহাগ পরিবহণ’ কিংবা ‘গ্রীনলাইন’তো ময়ূরপঙ্খী। জানালার সাইডে কোন রকমে দু’জনের বসার ব্যবস্থা; মাঝখানেতো তিনজন করে। তবে বলে রাখা ভালো, আমি ইকনোমী ক্লাসের যাত্রী, আমারো মনে রাখা উচিৎ ছিলো যে, বিমানের মধ্যেতো আর ফুটবল খেলার ব্যবস্থা থাকবে না। অন্যদিকে হুরীদের দেখতে গিয়ে, সত্যি কথা বলতে কি- নিজের উপর রাগ-ই হলো। কোনভাবেই ‘কতটুকু সুন্দরী’এই মানদণ্ডে কাউকে বিচার করা যায় না। এখানে কেউ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় আসেনি, এসেছে যার যার কর্মক্ষেত্রে। সত্যি কথা বলতে গিয়ে একটু মনে হয় মিথ্যাই বলে ফেললাম,নিজের উপর রাগ আসলে হয়নি, সব রাগ গিয়ে পড়েছে ওই হুজুরের উপর।

যথাসময়ে বিমান চলতে শুরু করলো। তার আগে জরুরী নির্দেশনা দেয়া হল। এবার আমাদের পাইলট নিজের পরিচয় এবং যাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। তার বলা ইংলিশের মাঝ থেকে শুধু কি একটা যেন নাম্বার আর টাইমটা উদ্ধার করতে পারলাম।

আর কিছুই বুঝলাম না। আমি নিজে যে বুঝতে পারলাম না, আমার নিজের ব্যর্থতা, সেদিকে আমার খেয়াল নেই; অথচ আমার ধারণা হয়েছে, এই পাইলট ব্যাটা শুদ্ধ করে ইংলিশটাও বলতে পারে না, আঞ্চলিক কোন এক ইংলিশ বলে ব'সে আছে। নিজেকে সাপোর্ট দিতে গিয়ে আবার নিজেই যুক্তি দেখালাম, 'বারাক ওবামা'র ইংলিশতো আমি ঠিকই বুঝতে পারি। অতএব, আমার না, নিশ্চিত করে পাইলটের ব্যর্থতা। তবে ইংলিশ শুদ্ধ বলুক আর অশুদ্ধ বলুক, নিপুণ দক্ষতায়, ক্ষণিকের মাঝে আমাদের নিয়ে সে উঠে গেল আকাশের রাজ্যে ।

এবার শুধু ছেড়ে যাবার পালা, দূরে যাবার পালা। উপর থেকে উপরে যাচ্ছে বিমান, যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে সব। সব, সব, সব কিছু। আমার অস্তিত্ব, আমার শৈশব, আমার কৈশোর, আমার শিকড়। তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশ, গরীব একটা দেশে জন্মগ্রহণ- এ-যে পাপ; মস্ত বড় পাপ। সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমরা চলে যাই, দূরে চলে যাই, সবকিছু ছেড়ে যাই, সবকিছু ছিঁড়ে যাই। দূরত্বের নীতি মেনে ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে নীচের সব। সামনে শুধু আকাশ, আকাশের ওপর আকাশ, অনন্ত অশেষ; পিছনে আমার, ভালোবাসার, অনেক আদরের বাংলাদেশ।

আমি জানি, নীচ থেকে উড়ে যাওয়া সবগুলো বিমানের দিকে তাকিয়ে আছে আমার 'মা'। কাঁদছে। আমি জানালা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করি, খুঁজতে চেষ্টা করি। খুঁজে পাই না।…(চলবে)

পরশপাথর
সেপ্টেম্বার ১৩,২০০৯
Poroshpathor81@yahoo.com